সংবাদ

তারিখ ... 9 APR 2013 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৬ ...

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চশিক্ষায় শুভঙ্করের ফাঁকি

সুলতান মাহমুদ রানা

গত ১ এপ্রিল ২০১৩ তারিখে যুগান্তরে প্রকাশিত ড. বুদরুত-ই-খুদা বাবুর 'বিশ্ববিদ্যালয় এবং উচ্চশিক্ষার ভরুদশা' শিরোনামের লেখাটি পড়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান নিয়ে পুনরায় চিন্তার সুযোগ সৃষ্টি হলো। এ হিসাবটি মোটামুটি সবারই জানা, বাংলাদেশে সরকারি-বেসরকারি মিলে এ পর্যন্ত প্রায় শতাধিক বিশ্ববিদ্যালয় (সরকারি-৩৪, বেসরকারি-৭০) গড়ে ওঠেছে যা শিক্ষা উন্নয়নের ক্ষেত্রে অত্যন্ত আনন্দের সংবাদ। পরিসংখ্যানে পরিষ্কার প্রতীয়মান যে, দেশে বিদ্যমান সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা দ্বিগুণেরও বেশি। গত ৩১ মার্চ ২০১৩ তারিখে সমকালে 'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় : ইউজিসির সীমাবদ্ধতা দূর হোক', ৩০ মার্চ ২০১৩ তারিখে '৩৬ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বৈধ ভিসি নেই' প্রকাশিত শিরোনামের সম্পাদকীয় ও প্রতিবেদন দেখে রীতিমতো হতবাক হয়েছিলাম : দেশের ৭০টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ৩৬টিতে বৈধ ভিসি নেই, মনিটরিং ব্যবস্থায় ইউজিসির সীমাবদ্ধতা ও সার্টিফিকেট বাণিজ্যসহ আইনানুগ নয় এমন কাজও যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো করছে- প্রতিবেদনে প্রকাশিত এমন সব তথ্য উচ্চশিক্ষায় শুভঙ্করের ফাঁকির প্রশ্ন উঠাই স্বাভাবিক বলে মনে হয়।

বর্তমান ও বিগত বিভিন্ন সরকারের সময়ে অনুমোদিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো শিক্ষার গুণগত মান বজায় রাখতে সক্ষম হচ্ছে কিনা তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। বিগত সেনা-সমর্থিত (ফখরুদ্দিন-মইনুদ্দিন) তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় থেকে শুরু করে পরবর্তীতে বর্তমান সরকারের সময় পর্যন্ত ইউজিসি ও শিক্ষা মন্ত্রণালয় দেশের অনেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রমের ওপর নানারকম বিধিনিষেধ ও শর্তারোপ করে। আর এসব শর্ত পূরণের ব্যর্থতায় অনেক বিশ্ববিদ্যালয় তাদের কার্যক্রম পূর্ণরূপে পরিচালনা করতে হিমশিম খেয়ে যায়। এ সূত্র ধরে বর্তমানে অনেক বিশ্ববিদ্যালয় তাদের পুরাতন সাইনবোর্ড নামিয়ে নতুন প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সাইনবোর্ড লাগিয়ে উচ্চশিক্ষা কার্যক্রমের যাত্রা শুরু করে এবং ইতিমধ্যেই বেশকিছু বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদনও লাভ করে। বর্তমান সরকার গত বছরের ১৮ নভেম্বর দেশে নতুন করে আরও সাতটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদন দেয়। ফলে দেশে এখন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৭০। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, আগের ৬৩টি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১০-এর শর্ত পূরণ না করেই চলছে। তবে লক্ষণীয় বিষয় হলো, দেশের বিভিন্ন জেলা ও থানা শহরসহ মফস্বল শহরগুলোতে কোচিং কমপ্লিটেক্স সেন্টারের মতো এসব প্রতিষ্ঠানের আউটার ক্যাম্পাসের সাইনবোর্ড এখনও রাস্তার পাশে ঝুলতে দেখা যায়। তবে সাইনবোর্ড ঝুললেও এ প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা আমার জানা নেই।

সাম্প্রতিককালের বিভিন্ন বছরের এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল বিচার করলে দেখা যায় যে, দেশের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলোর আসনসংখ্যা বিচার করলে অনেক মেধাবী (জিপিএ-৫ প্রাপ্ত) শিক্ষার্থী এসব প্রতিষ্ঠানে ভর্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। যা শিক্ষা ক্ষেত্রে সংকট সৃষ্টি করে। কাজেই দেশে বিদ্যমান বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যথাযথ তদারকির ব্যবস্থা করে সেখানে মানসম্মত শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করতে পারলে অনেক মেধাবী তাদের স্বপ্ন ও প্রত্যাশা থেকে ছিটকে পড়বে না বলে আশা করা যায়। এজন্য প্রয়োজনে সুনির্দিষ্ট বিধিমালা প্রণয়ন করে সে মোতাবেক প্রস্তাবিত নতুন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে অনুমোদনের ব্যবস্থা করা এবং দেশে বিদ্যমান বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন করা, যাতে শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষায় অংশগ্রহণ এবং তাদের শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত হয়।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরতে না পারলেও বিগত সময়কালে এমনকি বর্তমানে অনেক প্রতিষ্ঠানে রীতিমতো সার্টিফিকেট বাণিজ্য চলছে বলে অনেক তথ্য ইতিমধ্যেই বিভিন্ন মিডিয়াতে প্রকাশ পায়। কোন রকমে ভর্তি হয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করলেই, ভালো ফলাফলসহ সার্টিফিকেট পাওয়ার নানাবিধ নজির আছে বলে জানা গেছে। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে আউটার বা শাখা ক্যাম্পাসের অনুমোদন ছাড়া এখনও শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে বলে বিভিন্ন সময় অভিযোগ উঠেছে। এসব উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনভিজ্ঞ, অদক্ষ শিক্ষকমণ্ডলী কর্তৃক শিক্ষা কার্যক্রম কিংবা পাঠদানের ঘটনা ঘটছে কিনা তা তদারকির জোরালো ব্যবস্থাও লক্ষ্য করা যায় না।

ইতিমধ্যেই বিভিন্ন সময় প্রতারণা এবং প্রহসনের অপরাধে অভিযুক্ত এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বেশকিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সিলগালা করে দিলেও এখন পর্যন্ত অনেক প্রতিষ্ঠানই গোপনে সার্টিফিকেট বাণিজ্য করে যাচ্ছে বলে জানা যায়। নামসর্বস্ব এসব বিশ্ববিদ্যালয় এবং এর শাখা বা আউটার ক্যাম্পাসগুলোর শিক্ষা পদ্ধতি নিয়ে লিখতে হলে সবার আগে লিখতে হয় এসব প্রতিষ্ঠানে একজন শিক্ষক একটি কোর্সের পাঠদান করেন, প্রশ্ন করেন এবং খাতা মূল্যায়ন করেন- যা উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বড় ধরনের প্রতারণার সুযোগ থেকে যায়। এতে দেখা যায়, অনেক ছাত্র কোনরকমে ক্লাস এবং পরীক্ষায় অংশগ্রহণ না করেই সংশ্লিষ্ট শিক্ষককে ম্যানেজ করতে পারলেই ভালো ফলাফল অর্জন করতে পারে। এসব প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বিচারে কোন প্রতিষ্ঠান আদৌ কাজ করছে কিনা তাও একটু খতিয়ে দেখা দরকার। বিশেষ করে ফুল টাইম হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকমণ্ডলীর মান বিচারসহ শিক্ষার মান এবং প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী ভর্তির প্রক্রিয়ায় কতটুকু স্বচ্ছতা বজায় থাকে সেদিকটা সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের একটু ভেবে দেখা দরকার।

এছাড়াও এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেকগুলোতেই দূরশিক্ষণ প্রোগ্রাম নামের একটি বিশেষ প্রোগ্রাম চালু রয়েছে যা বাংলাদেশের শিক্ষা কাঠামোতে যোগ হওয়া অত্যন্ত আধুনিক একটি পদ্ধতি হলেও প্রকৃতঅর্থে শিক্ষার গুণগত মান বিচারে এর ফল অনেকটাই নিম্নমানের। তবে অত্যন্ত আশার কথা হলো এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে যথাযথ তদারকির ব্যবস্থা করে সুষ্ঠু ও মানসম্মত শিক্ষা কার্যক্রমের আওতাভুক্ত করা সম্ভব বলে মনে হয়। এজন্য প্রথমত বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) কিংবা শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক নতুন কোন তদারকি প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করা যাতে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রত্যক্ষ জবাবদিহিতার ক্ষেত্র তৈরি হয়। দ্বিতীয়ত সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সাইনবোর্ড পরিবর্তনের প্রবণতা বন্ধ করে স্থায়ীভিত্তিতে শিক্ষা কার্যক্রমের শক্তিশালী ও কঠোর কার্যক্রম হাতে নেয়া। তৃতীয়ত প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব সম্পত্তিতে স্থায়ী ক্যাম্পাস স্থাপন বাধ্যতামূলক। চতুর্থত সব শাখা ও আউটার ক্যাম্পাস বন্ধ করা এবং নতুন করে শাখা চালু করতে না পারার কঠোর বিধান। পঞ্চমত শিক্ষক নিয়োগের যোগ্যতা ও শিক্ষার্থী ভর্তির ক্ষেত্রে এক ও অভিন্ন কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা গ্রহণ যাতে অযোগ্য শিক্ষক নিয়োগ ও শিক্ষার্থী ভর্তিতে বাণিজ্য না হয়। ষষ্ঠত শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার প্রশ্ন প্রণয়ন ও তাদের পরীক্ষার খাতা একাধিক শিক্ষক কর্তৃক মূল্যায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ। সপ্তমত সব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য এক ও অভিন্ন সিলেবাস প্রণয়নের ব্যবস্থা। অষ্টমত যারা প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা বিবেচনাসহ তারা যাতে একাডেমিক কাজে হস্তক্ষেপ করতে না পারে তার আইনগত ব্যবস্থা থাকা এবং একাডেমিক প্রধান হিসেবে আলাদা কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে নিয়োগ দান। নবমত সরকারের পক্ষ থেকে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর স্থান ও ক্যাম্পাসভিত্তিক একটি তালিকা প্রকাশ করা যাতে শিক্ষার্থীরা এবং অভিভাবকরা বিভ্রান্তির মধ্যে না পড়ে। দশমত শিক্ষার্থীদের জন্য সরকার ঘোষিত নির্দিষ্ট টিউশন ফি'র ব্যবস্থা করা।

উচ্চশিক্ষায় প্রতারণা ও শুভঙ্করের ফাঁকি বন্ধের জোরালো পদক্ষেপ গ্রহণ করে দেশের লাখ লাখ শিক্ষার্থী ও অভিভাবকের প্রত্যাশা পূরণ ইউজিসি এবং সরকারকেই করতে হবে। এ জাতিকে শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ ও উচ্চশিক্ষায় শুভঙ্করের ফাঁকি থেকে রক্ষা করা শিক্ষার স্বার্থেই জরুরি।

[লেখক : শিক্ষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়]
sultanmahmud.rana@gmail.com